দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ

সকল সংস্কৃতির নির্দিষ্ট রয়েছে কিছু আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, যা সেই সংস্কৃতির মানুষের আচার-আচরণ ও কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দ্বারাই মানুষ নিজের এবং অন্যের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক বিচার করে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করতে চেষ্টা করে। মানব মনের লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ-ক্ষোভ, ভাবাবেগ ইত্যাদি অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার মূল্যবোধ ও আদর্শ। মানুষের সামাজিক জীবনে আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই যে কোনো সংস্কৃতিতেই ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এ অধ্যায়ে আমরা সংস্কৃতি ও ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে জানতে পারব।

চিত্র-২.১ ঃ চাকমা ও মারমাদের উপাসনালয়

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত আদর্শ বর্ণনা করতে পারব ;
- মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধসমূহ চিহ্নিত করতে পারব ;
- সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার ও প্রথাসমূহ বর্ণনা করতে পারব ;
- সমাজে প্রচলিত বিধি নিষেধের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নিষেধাজ্ঞা পালনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

পাঠ- ১: আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা

আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দ্বারাই মানুষ নিজের এবং অন্যের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক বিচার করে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করতে চেষ্টা করে। সাধারণভাবে আদর্শ ও মূল্যবোধ ব্যক্তির নিজস্ব বিষয় বলে মনে হলেও তা প্রকৃতপক্ষে কোনো না কোনোভাবে সংস্কৃতি থেকে পাওয়া। প্রতিটি সংস্কৃতিই তার নিজস্ব মূল্যবোধের ভিত্তিতে সেই সংস্কৃতির সদস্যদের শৈশব থেকে গড়ে তোলে। মানুষ সে অনুযায়ী আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। শৈশবকাল থেকে দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের কারণে যে কোনো সংস্কৃতির সদস্যদের কাছে এসব আচরণকে স্বাভাবিক মনে হয়।

আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে আলাদা হয়ে থাকে। যেমন, বাংলাদেশের বেশির ভাগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে বিবাহিত সন্তানেরা বাবা-মায়ের সাথে থাকে; কারণ এসব সংস্কৃতির মূল্যবোধে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে সন্তানেরা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে বাবা-মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে বসবাস করে। তাই বলা যায় যে, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ এমন কিছু রীতিনীতি, যা বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মানুষ কীভাবে বা কী ধরনের আচরণ করবে তা নির্ধারণ করে দেয়। মূলত সামাজিক শৃঙ্খলা বা ভারসাম্য রক্ষার জন্য সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানুষকে নির্দিষ্ট ধরনের কিছু আচরণ থেকে বিরত রাখে। যেমন, প্রায় সব সংস্কৃতিতেই চুরি করা বা মিথ্যা বলা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে আবার সংস্কৃতি ভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন ইসলামি মূল্যবোধে মুসলিমদের জন্য পশু কোরবানি দেওয়া কর্তব্য, আবার বৌদ্ধদের মাঝে সব ধরনের প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ। সুতরাং, একটি সমাজের মূল্যবোধ দিয়ে অন্য সমাজের মূল্যবোধকে বিচার করা যায় না। তাই মানুষের জীবন-বিধান ও আচরণের বিষয়গুলোকে বুঝতে হলে ঐ সংস্কৃতির আলোকে বুঝতে হবে।

মানুষ নানাভাবে মূল্যবোধ অর্জন করতে পারে। আমাদের জীবনে মূল্যবোধের প্রাথমিক শিক্ষা হয় পরিবার থেকে। পরিবারের সদস্যরা শিশুকে ভালো-মন্দ বিষয় এবং সঠিক আচরণ সম্পর্কে নানাভাবে শিক্ষাদান করে। বিদ্যালয়ে বা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও মানুষ নানা ধরনের আদর্শ ও মূল্যবোধ শেখে। তবে সব ধর্মের অনুসারীরা কম-বেশি নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধারণ ও লালন করে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	আদর্শ ও মূল্যবোধ কী?
কাজ- ২:	সমাজে মূল্যবোধের ভূমিকা কী?

পাঠ- ২: বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার

সংস্কৃতি ও পরিবেশের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে নৃবিজ্ঞান। সকল ধর্মই তিনটি মূল বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। যথা: (১) ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাস, (২) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও (৩) ধর্ম ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন। তাই ধর্ম সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের আলোচনায় এই তিনটি দিক বিবেচনা করা হয়।

ধর্ম হলো এক ধরনের বিশ্বাস, যা নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যে কোনো সংস্কৃতিতেই ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আমাদের চারপাশের পরিচিত দৃশ্যমান জগতের বাইরের কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস থেকে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও ভাবধারা গড়ে উঠে। এই অতিপ্রাকৃত শক্তি মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল ঘটনা, যেমন: ভালো-মন্দ, আশা- আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-হতাশা, আনন্দ-বেদনা, রোগ-বালাই ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার অধিকারী হলো অতিপ্রাকৃত শক্তি। বিশ্বব্যাপী প্রায় সকল সংস্কৃতিতেই মনে করা হয় যে, বিভিন্ন প্রার্থনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং উৎসর্গ, বিসর্জন বা বলিদানের মাধ্যমে এই অতি প্রাকৃত শক্তিকে তুষ্ট বা খুশি করা যায়। তাই মানুষ নিজেদের মঙ্গলের জন্য এই অতিপ্রাকৃত শক্তিকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে। ফলে দেখা যায়, ব্যক্তি পর্যায়ে আচার-আচরণ থেকে শুরু করে মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রা ও সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

প্রতিটি ধর্মের বর্ণনা সেই ধর্মের অনুসারীদের দিক থেকে যথাযথ ও সঠিক হওয়া প্রয়োজন। কেননা ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টানসহ যে কোনো ধর্ম বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সেই ধর্মানুসারীদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি আমাদের সকলের সচেতন থাকা উচিৎ। নিরপেক্ষভাবে যে কোনো ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হলে সেটা অন্যান্য সংস্কৃতি বা ধর্মের মানুষের কাছে অর্থবহ ও সহজে বোধগম্য হয়। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল ধর্মের অনুসারীরাই তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় ভাবধারা সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করে। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে ধর্ম নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই কেবল সকল মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো সম্ভব।

মানুষের বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠে যে কোনো সংস্কৃতির ধর্মীয় ব্যবস্থা। অনুসারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম হলো খ্রিষ্টান, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, তাও, শিন্টো ইত্যাদি। এসব ধর্মের পাশাপাশি ইহুদি, জৈন, শিখ, বাহাইসহ আরও অনেক ধর্মের অনুসারী পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে আছেন। আবার বর্তমান পৃথিবীর অনেকেই আছেন যারা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করেন না।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	সকল ধর্মের মূল তিনটি বিষয় কী কী?
কাজ- ২:	নৃবিজ্ঞানে কেন এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্ম পাঠ করা হয়?

পাঠ- ০৩: বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মীয় বিশ্বাসে বৈচিত্র্য

বাংলাদেশে রয়েছে অনেক নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ধর্মীয় দিক থেকে এখানে রয়েছে ৯১.০৮% মুসলমান, ৭.৯৬% হিন্দু, ০.৬১% বৌদ্ধ, ০.৩০% খ্রিষ্টান ও ০.০৬% অন্যান্য ধর্মের অনুসারী মানুষ। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী মানুষের মাঝে দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও পাশাপাশি বসবাস বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় দেওয়া হলো:

(১) আদি ও সর্বপ্রাণ ধর্মের অনুসারী: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অনেকেই ছিল সর্বপ্রাণ ধর্মের অনুসারী। তবে বর্তমানে এ সকল নৃগোষ্ঠীর অনেক মানুষই ধর্মান্তরিত হয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন। টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের গারো বা মান্দিদের সাংসারেক ধর্ম, সিলেটের মৈতৈদের (মণিপুরী) আপোক্পা বা সানামাহি ধর্ম, পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো, খুমি ও বোম এবং উত্তরবঙ্গের ওরাঁও, সাঁওতাল, মুন্ডা ও তুরীদের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি সর্বপ্রাণ ধর্মের অন্তর্গত। তবে বর্তমানে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন করেছে।

(২) সনাতন ও হিন্দু ধর্মের অনুসারী: হিন্দু ধর্মের অনুসারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গের হাজং এবং সিলেটের বিষ্ণুপ্রিয়া (মণিপুরী) নৃগোষ্ঠী। আবার উত্তরবঙ্গের অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিজেদের প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসে কিছুটা পরিবর্তন এনে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মে বিলীন হয়ে গেছে। অর্থাৎ বর্তমানে তারা হিন্দুধর্মের অনুসারী বলে পরিচিত হলেও তাদের কিছু কিছু আদি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়। এমন কিছু নৃগোষ্ঠী হলো বর্মন, রাজবংশী, কোচ, পাহান, ওরাঁও প্রভৃতি।

(৩) বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী: পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গা, খিয়াং, চাক, পাঙ্খোয়া এবং কক্সবাজার ও পটুয়াখালির রাখাইন নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রধানত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। এ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, যেমন, ম্রো ও খুমিদের কেউ কেউ ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হয়ে উঠছে।

(৪) খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী: পার্বত্য চট্টগ্রামের বম, লুসাই, ত্রিপুরা, পাঙ্খোয়া, চাকমা, মারমা, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের গারো বা মান্দি, উত্তরবঙ্গের ওরাঁও, সাঁওতাল, মুন্ডা, এবং সিলেটের খাসিদের অনেকেই খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

(৫) ইসলাম ধর্মের অনুসারী: বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের অনুসারী একমাত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো সিলেট অঞ্চলের পাঙন (মণিপুরী) নৃগোষ্ঠী। তবে ব্যক্তি পর্যায়ে অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বল্পসংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	বাংলাদেশে কোন কোন ধর্মের অনুসারী রয়েছে?
কাজ- ২:	আদি ও সর্বপ্রাণবাদ ধর্মের অনুসারী কারা?

পাঠ- ০৪ ও ০৫: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে ধর্মের উৎপত্তি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজে ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তোমাদের কিছু সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য ধর্মের উৎপত্তির দুটি ব্যাখ্যা নিয়ে এখানে আলোচনা করছি। যথা: (১) আত্মার ধারণা থেকে ধর্মের উৎপত্তি এবং (২) জাদুবিদ্যা থেকে ধর্মের উৎপত্তি।

(১) আত্মার ধারণা থেকে ধর্মের উৎপত্তি: খুবই সাধারণ কিছু প্রাকৃতিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাচীন মানুষের জানা ছিল না। এ ধরনের একটি সাধারণ ঘটনা হলো মানুষের ঘুমিয়ে পড়া। ঘুমের মাঝে মানুষ স্বপ্ন দেখে থাকে। আর স্বপ্নে সে অনেকসময় অতীতের কোনো ঘটনা কিংবা মৃত বা অচেনা কোনো ব্যক্তিকে জীবন্ত দেখে থাকে। এই বিষয়গুলো প্রাচীনকালের মানুষকে অনেক ভাবিয়ে তোলে। এছাড়াও,

জীবিত, ঘুমন্ত ও মৃত মানুষের দেহের পার্থক্য কী? আবার ঘুমন্ত মানুষ যেমন জেগে উঠে, তেমনি মৃত মানুষ কেন জেগে উঠে না বা ফিরে আসে না? দিনের বেলা কেন মানুষের ছায়া সব সময় তাকে অনুসরণ করে? এ ধরনের নানা প্রশ্ন নিয়ে মানুষ কৌতূহলী হয়ে উঠে।

আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা আর অনুমানের ভিত্তিতে আদি মানুষেরা এসকল প্রশ্ন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। তারা অনুমান করে যে, মানুষের শরীরের ভিতরে অদৃশ্য কিছু অবস্থান করে। এভাবেই প্রথম প্রাচীন মানুষ আত্মার ধারণা লাভ করে। মানব দেহে আত্মার ধারণা লাভের ফলে মানুষের মৃত্যু, স্বপ্ন দেখা, ঘুমিয়ে পড়ার সময় মানুষের কী হয়, এসব প্রশ্নের জবাব মানুষ খুঁজে পায়। মানুষের দেহে আত্মার অবস্থানের কারণে মানুষ জীবিত থাকে। দেহ থেকে আত্মা চলে গেলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। প্রাচীন মানুষের ধারণা অনুযায়ী, আত্মা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এবং এক দেহ থেকে অন্য দেহে ভ্রমণ করতে পারে। আত্মার কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই বলে তারা ধারণা করত যে, শুধু মানুষ থেকে মানুষের দেহেই নয়, বরং যে কোনো প্রাণীর দেহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গাছপালা, এমনকি, প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন বস্তুতেও আত্মা অবাধে বিচরণ করতে পারে। অর্থাৎ, আত্মা যে কোনো প্রাণী, গাছপালা কিংবা বস্তুর আকার ধারণ করতে পারে বলে মানুষ বিশ্বাস করে। আদি মানুষ আরও মনে করত, ঘুমানোর সময় আত্মা জীবিত মানুষের দেহ ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারে এবং সে কারণেই মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় বিভিন্ন ঘটনা দেখতে পায় স্বপ্নের মাধ্যমে। অর্থাৎ, স্বপ্ন হলো ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের আত্মা অন্যত্র চলাফেরা বা বিচরণ করার ফলে দেখা ঘটনা যেগুলো জেগে থাকার সময় দেখা যায় না। আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মা একেবারে দেহকে ছেড়ে যায়। তারা আরও বিশ্বাস করত মানুষের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু বা ধ্বংস হয় না কখনো। তাই মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখা যায়।

আদি মানুষ আরও মনে করত, আত্মার ক্ষমতা সাধারণ জীবিত মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। অলৌকিক বা অতিজাগতিক ক্ষমতার অধিকারী আত্মা মানুষের মঙ্গল কিংবা অমঙ্গলের কারণ হতে পারে বলে মানুষ মনে করত। আত্মা যেমন মানুষের জন্য অনিষ্টকর বা ক্ষতিকর হতে পারে, তেমনি আত্মা মানুষের উপকারও করতে পারে। মানুষের কাজে আত্মারা যেমন খুশি ও সন্তুষ্ট হতে পারে, তেমনিভাবে বিরক্ত, অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই বিভিন্ন সমাজের মানুষ নানা কাজের মাধ্যমে আত্মাদের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করতে থাকে। আবার আত্মারা বিরক্ত হতে পারে এমন কাজ এড়িয়ে চলতেও মানুষ সদা সচেষ্ট থাকে। এভাবেই আত্মার ধারণাকেই ধর্মের উৎপত্তির মূল ভিত্তি বলে মনে করেন নৃবিজ্ঞানীরা। আদি থেকে বর্তমানের সকল সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের মাঝেই বিভিন্নভাবে আত্মার ধারণা রয়েছে।

(২) জাদুবিদ্যা থেকে ধর্মের উৎপত্তি: প্রকৃতির উপর মানুষ সব সময়ই নির্ভরশীল। ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা থেকে শুরু করে বন্য প্রাণীর আক্রমণ কিংবা শীত-গ্রীষ্মকাল প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনার উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ সব সময়ই ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। তাই মানুষ সব সময়ই প্রাকৃতিক অবস্থা বা চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শিখেছে। আদি যুগে মানুষের জীবনে নানা রকম অনিশ্চয়তা ও ভীতির পরিমাণও ছিল অনেক বেশি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা থেকে মানুষ নিজেদের নিরাপদ রাখার চেষ্টা করেছে। নিরাপত্তা বিধান ও বিভিন্ন অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য মানুষ সর্বকালেই প্রকৃতিকে জানার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকৃতিকে পরিচালিত করার চেষ্টা

করেছে। মানুষের এই প্রচেষ্টা থেকেই জাদুবিদ্যার উদ্ভব। এভাবে নানা কলাকৌশল প্রয়োগ করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা পূরণের জন্য জাদুবিদ্যা ব্যবহৃত হতো বলে মনে করা হয়।

অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জাদুবিদ্যার প্রচলন দেখা যায়। জাদুবিদ্যার দ্বারা মানুষ নানাভাবে বিভিন্ন অনিশ্চয়তা দূর করার এবং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন ঘটনার ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। যেমন: শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য বাণ মারার প্রচলন বিভিন্ন সংস্কৃতিতে আছে। কোনো ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের জন্য তার দেহের কোনো অংশ যেমন, চুল, নখ ইত্যাদিসহ মন্ত্রের ব্যবহার করা জাদুবিদ্যার অন্তর্গত। আবার কাউকে সাপে কামড়ালে ওঝার কথাই সবার আগে মনে হয়। এছাড়া, বিভিন্ন রকম জটিল রোগ-ব্যাধি ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার জন্য অনেকেই ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র, তাবিজ-কবচ ইত্যাদির সাহায্য নেয়। এ সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসক, তান্ত্রিক বা ওঝার আলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে মানুষ।

আদিকালে মানুষ শুধু জাদুবিদ্যা নির্ভর থাকলেও ক্রমশ তারা এর বিভিন্ন দুর্বল দিক আবিষ্কার করে। মানুষ বুঝতে পারে যে, শুধু জাদুবিদ্যা দিয়ে প্রকৃতির সব বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ওঝাদের সীমিত ক্ষমতা ও জাদুবিদ্যার দুর্বলতা থেকে মানুষের মাঝে ক্রমশ অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তি এবং দেবতা ও দেবীদের ধারণার সৃষ্টি হয়। ধর্ম ও জাদুবিদ্যা মূলত বিশ্বাস নির্ভর। জাদুবিদ্যা বাস্তবে কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারুক বা না পারুক এর অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, জাদুর মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণ বা পরিস্থিতি পরিবর্তন সম্ভব। ধর্মের ক্ষেত্রেও একই বিষয়। ধর্মের অনুসারীরা মনে করেন যে, সৃষ্টিকর্তা বা দেবতাদের দ্বারাই বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। এভাবে প্রাচীনকালের মানব সমাজে জাদুবিদ্যা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয় বলে নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মের উৎপত্তি কীভাবে হলো?
কাজ- ২:	বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জাদুবিদ্যার প্রচলন হলো কেন? তোমার ধর্মে কী জাদুবিদ্যার প্রচলন আছে?

পাঠ- ০৬: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মীয় বিশ্বাসে অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা

প্রকৃতির অনেক ঘটনাই মানুষ তার স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে না। এছাড়াও রয়েছে মানুষের মৃত্যুভয় এবং বেঁচে থাকা নিয়ে অনেক ধরনের অনিশ্চয়তা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসে এ সকল ঘটনা বা জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে নানা ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে।

অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানুষের চেনা জগতের বা পৃথিবীর বাইরের কোনো জগৎ সম্পর্কে ধারণা। এদের অনেকেই বিশ্বাস করে যে, অতি প্রাকৃত শক্তি ঘিরে একটা জগৎ আছে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই অতিপ্রাকৃত জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের চেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন অতিপ্রাকৃত সত্তা বা শক্তি দ্বারা। যেহেতু মানুষ বিশ্বাস করে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তা বেশি ক্ষমতাশীল, মানুষ তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আর তাই মানুষ প্রার্থনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উৎসর্গ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অতিপ্রাকৃত সত্তা বা শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। বিশ্বাস করে যে, অতিপ্রাকৃত শক্তির সন্তুষ্টি লাভের সাথে মানুষের ও সমাজের কল্যাণের বিষয়গুলো জড়িত।

বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী চার ধরনের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ও শক্তির কথা জানা যায়। যথা: (১) সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর বা ভগবান; (২) দেবতা ও দেবী; (৩) পূর্বপুরুষ বা অন্যান্য মৃত মানুষের আত্মা; এবং (৪) অতিপ্রাকৃত বা অতিজাগতিক সত্তা ও শক্তি।

(১) সৃষ্টিকর্তা ও ঈশ্বর: ইসলাম ও খ্রিষ্টানসহ আরও কিছু ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ মনে করে সৃষ্টিকর্তা হলেন একক সত্তা এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ ধরনের ধর্মকে একেশ্বরবাদী ধর্ম বলা হয়।

(২) দেবতা ও দেবী: অনেক ধর্মে বিভিন্ন দেবতা ও দেবীর ধারণা রয়েছে। এই দেব-দেবীদের অস্তিত্ব, ভাবাবেগ, অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড অনেকটা মানুষের মতো হলেও এরা হলেন বিশেষ অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ক্ষমতার অধিকারী। কোনো কোনো ধর্মে একাধিক দেবতা ও দেবীর ধারণার উল্লেখ আছে। মনে করা হয় দেব-দেবীদের একেকজন একেক ধরনের আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। এ ধরনের ধর্মকে বহুশ্বরবাদী ধর্ম বলা হয়। পুরাণ বা ধর্মীয় কাহিনিতে দেব-দেবীদের জীবন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে দেব-দেবীর সন্তুষ্টির জন্য নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে।

(৩) পূর্বপুরুষ বা অন্যান্য মৃত ব্যক্তির আত্মা: অন্যান্য ধর্মের মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মেও মানুষের মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তিকে ঘিরে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরাও বিশ্বাস করে যে মানব দেহ থেকে আত্মা চলে গেলে মানুষের মৃত্যু হয়। মৃতদেহকে পুড়িয়ে ফেলা বা কবর দেওয়া হলেও মৃত ব্যক্তির আত্মা দেখা যায় না। অদৃশ্য আত্মার ক্ষমতা ও বিচরণ নিয়ে রয়েছে মানুষের অনেক ভয়, বিশ্বাস ও কল্পনা। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে অনেক নৃগোষ্ঠীর মানুষই মনে করে, তাদের মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা তাদের কাছাকাছিই থাকে। তাদের পূর্বপুরুষের আত্মা তাদের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকাও রাখতে পারে। তাই তারা মৃত পূর্বপুরুষের আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে ও নানা কিছু উৎসর্গ করে থাকে। অন্যান্য সমাজের মতো অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে মনে করা হয় যে আত্মহত্যা, অপঘাত বা দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হলে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিত মানুষদের ভয় দেখানো বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। এই ধরনের আত্মাকে ভূত, পেত্নি, অশরীরী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়।

(৪) অতিপ্রাকৃত বা অতিজাগতিক সত্তা ও শক্তি : তোমরা বিভিন্ন ভূত-প্রেতের গল্প শুনেছ। এগুলোও এক ধরনের অতিপ্রাকৃত সত্তা। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে বিভিন্ন রকমের অতি প্রাকৃত সত্তা বা শক্তির ধারণা রয়েছে। পরী, দেও, অপদেবতা, রক্ষাকারী দেবতা ও অন্যান্য অতি প্রাকৃত সত্তা মানুষের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বলে অনেক নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করে। আবার অনেকে মনে করে যে অতি প্রাকৃত শক্তিকে খালি চোখে দেখা না গেলেও অনুভব করা যায় এবং এরা মানুষের উপকার বা অনিষ্ট দুইই করার ক্ষমতা রাখে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	অতিপ্রাকৃত সত্তা বা শক্তি কত ধরনের হতে পারে?
কাজ- ২:	মানুষ কেন ও কীভাবে অতিপ্রাকৃত সত্তা বা শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে?

পাঠ- ০৭: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মীয় পুরাণ ও বিশ্বাস

ধর্মীয় দিক থেকে পবিত্র কাহিনীকে পুরাণ বা মিথ বলা হয়। সকল ধর্মের মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সনাতনী ধর্মে কীভাবে জগৎ সৃষ্ট হলো, কীভাবে মানুষের জন্ম হলো—কী তার আচার, আচরণ ও সংস্কৃতি এ সংক্রান্ত কাহিনীর বিবরণ আছে। অতিপ্রাকৃত শক্তির ধরন, সৃষ্টিকর্তা ও দেব-দেবীর অলৌকিক ক্ষমতা এবং মহাজগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়বস্তু নিয়ে গড়ে উঠে অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় পুরাণ বা মিথ। এসব পৌরাণিক কাহিনি থেকে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায়। ধর্মীয় পুরাণ বা মিথের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমাজের অনেক রীতি-নীতি, প্রথা ও আইন-কানুন গড়ে উঠে। মানুষের ভালো-মন্দ, জীবন-মৃত্যু, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সমাজের উঁচু-নিচু জাত ইত্যাদি বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনির মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এজন্য পৌরাণিক কাহিনিগুলো মানুষের কাছে সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। এসব কাহিনিকে ঘিরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে পালিত হয় নানারকম আচার-অনুষ্ঠান।

এবার তোমাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী ম্রোদের একটি পৌরাণিক কাহিনি বলব। ম্রো গোষ্ঠীর লোকজন সর্বপ্রাণবাদী ধর্মের অনুসারী। ম্রোরা নিজেদের ম্রোচা বলে থাকে। 'ম্রো' অর্থ মানুষ আর 'চা' অর্থ দল। ম্রো পুরাণ অনুযায়ী, ভূলোকের সৃষ্টিকর্তা থুরাই একবার পৃথিবীর সব জাতি বা দলকে একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি নির্দিষ্ট সময় তার কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সেই সম্মেলনে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যে প্রতিনিধি উপস্থিত হবেন তার হাতে তিনি সেই গোষ্ঠীর ধর্মগ্রন্থ তুলে দেবেন। এছাড়াও তাদের জন্য পালনীয় ধর্মের বিধিনিষেধ এবং রীতি নীতি সেই প্রতিনিধিকে বুঝিয়ে বলবেন। যাহোক, সেই দিনের সেই সম্মেলনে ম্রো প্রতিনিধি যথাসময়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ, তাই তাঁর হেঁটে আসতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। তিনি যখন পৌঁছালেন তখন দেখলেন সভাস্থান শূন্য। ইতোমধ্যে, ম্রোদের প্রতিনিধি উপস্থিত না হওয়ায়, সৃষ্টিকর্তা থুরাই একটি গরুকে ম্রো জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের ধর্মগ্রন্থটি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ধর্মগ্রন্থটি ছিল কলাপাতায় লেখা। গরুটি ধর্মগ্রন্থটি নিয়ে ম্রোদের কাছেই আসছিল, কিন্তু পথে তার খুব খিদে পাওয়ায় সে কলাপাতায় লেখা ধর্মগ্রন্থটি খেয়ে ফেলে। এর ফলে থুরাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া, ম্রোদের ধর্মগ্রন্থ তো বটেই, তাদের ভাষার লিখিত রূপ বা বর্ণমালাও হারিয়ে গেল।

এই পুরাণ অনুযায়ী গরুর কারণে ম্রোরা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হারিয়েছে বলে বিশ্বাস করে। আর যেহেতু ঐ হারানো ধর্মগ্রন্থটি লিখিত ছিল তাদের মাতৃভাষায়, তাই বর্তমানে তাদের মাতৃভাষার কোনো লিখিত রূপ বা বর্ণমালা নেই। শুধু তা-ই নয় গরুটি ম্রোদের কাছে এসে বলে যে থুরাই তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু, ম্রোরা পরবর্তীতে সৃষ্টিকর্তা থুরাইয়ের সাথে দেখা হলে সত্য ঘটনা জানতে পারে। সৃষ্টিকর্তা থুরাই মিথ্যা কথা বলার অপরাধে ম্রোদের গরুকে শাস্তি প্রদানের অনুমতি ও অধিকার দেন। তাই ম্রোদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব হলো 'চিয়াছত পয়'। এই উৎসবে ম্রোরা একটি গরুকে তাদের ধর্মগ্রন্থ খেয়ে ফেলার শাস্তি স্বরূপ সকলে মিলে হত্যা করে। এছাড়াও মিথ্যা বলে তাদের বিভ্রান্ত করার অপরাধে গরুটির জিহ্বা কেটে নেওয়া হয়। ম্রোরা এই গরু হত্যা উৎসবটি করে থুরাইয়ের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময় এই 'চিয়াছত পয়' উৎসবে গোহত্যা করা ছাড়াও, অসুস্থতা থেকে আরোগ্যলাভের জন্য বা কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও তারা এই আচার-অনুষ্ঠানটি পালন করে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ধর্মীয় ভাবধারা ও বিশ্বাসের উপাদান কী কী?
কাজ- ২:	মিথ বা ধর্মীয় পুরাণ কাকে বলে?

পাঠ- ০৮: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

ধর্মীয় ভাবধারা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের বিভিন্ন আচরণ, কার্যাবলি বা অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এগুলোকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়ে থাকে। এই আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অত্যাবশ্যক বিষয়। আচার-অনুষ্ঠানগুলো এর অর্থ ও গুরুত্বের দিক থেকে দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যক্রমের চেয়ে আলাদা হয়। অতিপ্রাকৃত শক্তিকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে নিজেদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে এগুলো পালনের মাধ্যমে তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র আত্মা, শক্তি বা জগতের সাথে নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করে।

কোনো কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক ভঙ্গির ব্যবহার করে, পবিত্র বাণী উচ্চারণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বা সামগ্রী ব্যবহার করে। ধর্ম বিশ্বাসীদের জন্য এই কার্যক্রম পালন করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। অতিপ্রাকৃত শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য পালিত এসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোর পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন, (১) প্রার্থনা, সাধনা ও ভক্তিমূলক, (২) বলিদান, উৎসর্গ বা বিসর্জনমূলক এবং (৩) জাদুবিদ্যামূলক। সংস্কৃতি ও ধর্ম ভেদে এই আচার-অনুষ্ঠানগুলোর দৃশ্যমান রূপ বা উপস্থাপনে পার্থক্য দেখা যায়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরে অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যরাও এ ধরনের অনেক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। যেমন মৃত ব্যক্তির দেহের সৎকার ও আত্মার কল্যাণের জন্য সব সমাজেই কিছু না কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবধারা অনুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মা ও তার পরিবারের কল্যাণের জন্য কেউ মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে, আবার কেউবা মৃতদেহকে কবর দেয়। আর মৃতদেহ সৎকারের আগে ও পরে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। আবার বিশেষ কোনো ইচ্ছাপূরণের জন্য, রোগ কিংবা বিপদ মুক্তিতে সাহায্যের আশায় ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। এ সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ধরন এবং পালনের উদ্দেশ্য ও সামাজিক ফলাফল এখানে আলোচনা করা হলো :

আচার-অনুষ্ঠানের ধরন	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্য	আচার-অনুষ্ঠান পালনের সামাজিক ফলাফল
ভাবাবেগ বৃদ্ধির কৃত্য বা আচার-অনুষ্ঠান	(১) প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ; (২) ব্যক্তির নিয়তি বা ভাগ্য নির্ধারণ; (৩) গোষ্ঠী বা সমাজের সকলের নিয়তি বা ভাগ্য নির্ধারণ; (৪) পাপ মোচন অর্থাৎ পাপ কাজের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়া; (৫) ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়ন ও সাধনার জন্য।	নির্দিষ্ট সমাজের অভ্যন্তরের: (১) বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে; (২) বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলের মাঝে সামাজিক সংহতি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে উঠে, দৃঢ় হয় এবং বজায় থাকে।
জীবন পর্যায় পরিবর্তনের কৃত্য বা আচার-অনুষ্ঠান	ব্যক্তিজীবনের বা জীবনচক্রের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে সামাজিক মর্যাদা আর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটান। যেমন: (১) একটি শিশুর জন্ম উপলক্ষে পালিত আচার-অনুষ্ঠান; (২) একটি শিশুর নামকরণের আচার-অনুষ্ঠান; (৩) বাচ্চাদের বয়ঃসন্ধির সময় পালিত আচার-অনুষ্ঠান; (৪) বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান; (৫) মৃত্যু ও মৃতদেহ সৎকার নিয়ে পালিত আচার-অনুষ্ঠান।	(১) ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের পরিবর্তন। (২) সামাজিক দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি ও বৈধতা অর্জন। যেমন বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটি দম্পতি এক সাথে থাকা কিংবা সন্তান জন্মদানের স্বীকৃতি ও বৈধতা অর্জন করে।

নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সামাজিক সংহতি ও ঐক্যের বোধ ধরে রাখার জন্য এ সকল নৃগোষ্ঠীর মাঝে বিদ্যমান আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। মসজিদ, মন্দির, চার্চ কিংবা প্যাগোডাতে অথবা সমাজের সবাই একসাথে মিলিত হয়ে নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও একাত্মতার চেতনা গড়ে উঠে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানুষ কেন পালন করে?
কাজ- ২:	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সামাজিক ফলাফল কী কী?

পাঠ- ০৯: পার্বত্য চট্টগ্রামে ম্রো সংস্কৃতিতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান

পূর্ববর্তী পাঠে তোমরা ম্রো-দের ধর্মীয় পুরাণ সম্পর্কে জেনেছ। এবারে তাদের একটি ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবে। ম্রো গ্রামগুলোতে ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, কলেরা এসব রোগ প্রায়ই মড়ক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি বছর বহু ম্রো এসব রোগে আক্রান্ত হয়। আর আরোগ্য লাভের জন্য তারা ধর্মীয় চিকিৎসা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর বেশি নির্ভর করে। সুস্বাস্থ্য এবং খাদ্য উৎপাদন তাদের জীবনে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ম্রো –রা অন্যসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মূলত রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য এবং বেশি ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে পালন করে থাকে। প্রতিবছর জুমচাষের প্রাক্কালে অর্থাৎ জুমের খেতে বীজ বপনের আগে ম্রো গ্রামগুলিতে 'কুয়া খাং' নামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। প্রতিটি ম্রো গ্রামের সকলে মিলে তার দিনক্ষণ নির্ধারণ করে। সাধারণত মার্চ মাসে এই অনুষ্ঠানটি পালিত হয়ে থাকে।

'কুয়া' অর্থ হলো গ্রাম ও 'খাং' অর্থ হলো বন্ধ করে দেওয়া। প্রতিটি ম্রো গ্রাম পৃথক ভাবে 'কুয়া খাং' পালন করে। আর তা পালন করার মধ্যে দিয়ে ম্রো গ্রামটিতে কোনো রোগ বা অশুভ কিছুর প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে তারা বিশ্বাস করে। এই আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমে গ্রামের সীমানা নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়। তারপর গ্রামটিকে বন্ধ ঘোষণা করা হয় যেন সব রোগ ও অমঙ্গল গ্রামের সীমানার বাইরে থাকে। দুই বা তিন দিন ধরে এই 'কুয়া খাং' পালন করা হয়। গ্রামের সবাই আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে এতে অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে যিনি নেতৃত্ব দেন তাকে বলা হয় 'স্রা' বা 'ওয়াম্মাহ'। সাধারণত ম্রো গ্রামটির প্রধান বা কারবারি 'ওয়াম্মাহ'-র ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও তাঁর দুইজন সহকারী থাকে যাদের বলা হয় 'প্লাইরিয়া'।

গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে 'কুয়া খাং' পালনের জন্য কিছু মুরগি সংগ্রহ করা হয়। একটি ছাগলও জোগাড় করা হয়। এছাড়াও নিয়ম অনুসারে প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে মুরগি প্রদান করতে হয়। যারা সামর্থ্যবান তারা একাধিক ও যার সামর্থ্য কম সে মুরগির বিনিময়ে অন্য কিছু প্রদান করে। 'কুয়া খাং' এর প্রথম দিনে মুরগিগুলোকে বধ করা হয় এবং গ্রামবাসীর জন্য ভোজের আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় দিনে ঝর্ণার ধারে ছাগলটিকে বধ করা হয় যেন ছাগলটির রক্ত ঝর্ণার ধারায় মিশে যায়। এই দুই দিন কোনো বহিরাগতকে গ্রামে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। গ্রাম থেকেও কেউ বাইরে যেতে পারে না। অর্থাৎ ঐ গ্রামের সাথে বাইরের কারও যোগাযোগ থাকে না। এমনকি গ্রামের কোনো বাড়ির মেয়ের যদি বিয়ের বর অন্য কোনো গ্রামের বাসিন্দা হয়ে থাকে, তাহলে 'কুয়া খাং' আচার পালনের সময় তাকেও গ্রামে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। গ্রামবাসী ছাড়া অন্য কাউকে এই সময় গ্রামে থাকতে দিলে দুর্ভোগ, দুর্যোগ, রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে বলে তারা মনে করে। আচারটি পালনের শেষে 'ওয়াম্মাহ' ও তার দুই সহকারী বা 'প্লাইরিয়া'কে বিভিন্ন উপহার ও পাগড়ি দিয়ে সম্মানিত করে। বছরে একবার এই আচার পালন করার রীতি থাকলেও কোনো রোগের মড়ক লাগলে বা কারও অসুস্থতা সারিয়ে তুলতে বছরে অন্য সময়ে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	'কুয়া খাং' কেন পালন করা হয়?
কাজ- ২:	কীভাবে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়?

পাঠ- ১০: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ও মানব জীবনে ধর্মের প্রভাব

বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে অনেক পার্থক্য থাকলেও পৃথিবীব্যাপী সকল ধর্মের রয়েছে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সকল নৃগোষ্ঠীর ধর্মেই অতিপ্রাকৃতের প্রতি এক ধরনের ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ থাকে। এই বোধের দ্বারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য ও পবিত্র-অপবিত্রের সীমারেখা টানে, আর সে অনুযায়ী আচরণ করে। কেননা, তাঁরা মনে করে যে, এই নির্দিষ্ট ভালো আচরণের দ্বারাই মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে। অতিপ্রাকৃত শক্তির অনুগ্রহ লাভের আশায় সকল নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা বিভিন্ন অনুশাসন মেনে চলে। এই ধর্মীয় অনুশাসনগুলোকে বলে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা।

পৃথিবীব্যাপী সকল ধর্মেই অন্য মানুষের প্রতি ভালো আচরণ ও মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত কাজকে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি ভক্তির নিদর্শন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মাঝে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান বিরাজমান। সময়ের সাথে সাথে সকল নৃগোষ্ঠীর ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক কিছু বদলে গেলেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনে ধর্মের উপস্থিতি রয়েই গেছে। এ কারণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে ধর্মের কার্যকারিতা ও ভূমিকা বুঝতে পারা জরুরি। ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলো হলো:

(১) সামাজিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কোনো একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা ভালো-মন্দ সংক্রান্ত ধ্যানধারণা গঠন করে এবং সমাজে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ধরা যাক, তুমি কারও বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখলে খুব সুন্দর একটি জিনিস, যা তোমার নিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। তুমি যদি কাউকে না জানিয়ে জিনিসটি নিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েও যাও, তবুও তুমি তা নাও না, কারণ তুমি জানো একে বলে চুরি এবং চুরি করা অন্যায় ও পাপ কাজ। একই ভাবে, মিথ্যা বলা, কিংবা কাউকে আঘাত করা এগুলোও তাদের সমাজের চোখে অন্যায় বলেই মানুষ তা করা থেকে বিরত থাকে। এই ন্যায়-অন্যায়ের বোধ তারা প্রধানত তাদের ধর্ম থেকে পায়, আর এই নৈতিকতা বোধই তাদেরকে নানা অপকর্ম ও অনাচার থেকে বিরত রাখে।

(২) জীবন-মৃত্যু ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৌতূহলও চিরন্তর। তারাও কখনো না কখনো ভাবে 'আমি কোথা থেকে এলাম? মানুষই বা কোথা থেকে এলো? মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব? বিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হলো?' তাদের ধর্মও তাদের কোনো না কোনোভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়। জীবন-মৃত্যু, বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্ম মানুষের সাথে প্রকৃতির এবং মানুষে-মানুষে সম্পর্কের দিক-নির্দেশনা দেয়। এভাবে মানুষের জীবন ও বেঁচে থাকাকে অর্থবহ করে তোলে ধর্ম।

(৩) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের নানা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে সমাজের সদস্যদের মাঝে একাত্মতা ও সংহতিবোধ তৈরি করে, যার মাধ্যমে তাদের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং সমাজ-ব্যবস্থা টিকে থাকে। এ সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আর মূল্যবোধ আরও প্রগাঢ় ও সুদৃঢ় হয়। এভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঐ ধর্মের অনুসারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের মাঝে সামাজিক স্থিতি ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

(৪) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে নানাভাবে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ভোগে। এছাড়াও রয়েছে নানাবিধ অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা। এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করে সফলতা লাভের আশায় এ সকল সমাজের

মানুষেরা অতিপ্রাকৃত সত্তার কাছে প্রার্থনা জানায় বা বিভিন্ন আচার পালন করে। অনিশ্চয়তার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ধর্ম তাদেরকে সহযোগিতা করে বলে তারা বিশ্বাস করে।

(৫) বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করে যে পবিত্রতা সংক্রান্ত কার্যাবলির মধ্য দিয়ে মোহ ও ভীতি দুই ধরনের অনুভূতিই তৈরি হয়। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের মানসিক মুক্তিও ঘটে। এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী অনুভূতি, যেমন –ভয়, অপরাধবোধ, অনুতাপ, লজ্জা, ক্রোধ এবং উৎকণ্ঠার মুক্তি ঘটে এবং ইতিবাচক অনুভূতি যেমন–আশা, শান্ত, সৌহার্দ ইত্যাদি জন্ম হয়।

(৬) অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ তার চারপাশের জগতের অনেক কিছুকে স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না, ধর্ম তাদেরকে এক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। নানা ধরনের আবেগ, উৎকণ্ঠা (সিদ্ধান্তহীনতা) ও মানসিক চাপ থেকে তারা মুক্তিলাভ করে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে। আবার ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে নানাভাবে অন্যকে সহযোগিতা করার জন্য উৎসাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজে কোনো ইহজাগতিক লাভ না থাকলেও পারলৌকিক পুরস্কার ও পুণ্যের ভাবনা তাদেরকে নানা ধরনের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করে।

ধর্মের কার্যাবলি: পৃথিবীর সকল ধর্মই মানুষকে অন্যদের প্রতি সহনশীল ও মানবিক আচরণের শিক্ষা দিলেও কিছু কিছু অনুসারীর মধ্যে এক ধরনের অনমনীয় মনোভাব দেখা যায়। এরা অন্য মানুষের ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকে। অন্য ধর্ম বা অন্য ধর্মীয় মতবাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিরূপ মনোভাব সমাজে নানা বিপদ ও সংঘাত ডেকে আনতে পারে। এই ধরনের কিছু সমস্যা বাদ দিলে, সাধারণ অর্থে সমাজ ও ব্যক্তির নৈতিকতা ও মানব কল্যাণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মের অনেক কার্যকর ভূমিকা রয়েছে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে। ধর্মের নানা ধরনের মনোজাগতিক ও সামাজিক প্রভাব রয়েছে যেমন:

মনোজাগতিক প্রভাব	সামাজিক প্রভাব
○ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অজানা বিষয় সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রদান করে।	○ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আচরণবিধি প্রতিষ্ঠার নৈতিক রূপরেখা প্রদান করে।
○ অজানা ও অস্পষ্ট বিষয়কে ব্যাখ্যা করে ভীতি, দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করে।	○ সামাজিক শৃঙ্খলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করে।
○ সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে।	○ সমাজের সংহতি ও সম্প্রীতি ধরে রাখে।
○ অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তির সাহায্য ও সহায়তা লাভের আশা মানুষকে এক ধরনের নিরাপত্তাবোধ দেয়।	○ কোনো সামাজিক দলের সাথে ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় ও সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।
	○ সামাজিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় দাও।
কাজ- ২:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনে ধর্মের মনোজাগতিক ও সামাজিক প্রভাবসমূহ কী?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সমষ্টি হচ্ছে মানুষের-

ক. বিবেক খ. আদর্শ
গ. আচরণ ঘ. কর্ম

২. ধর্মের বৈশিষ্ট্য হলো-

i. অতিপ্রাকৃত শক্তি ও সত্তায় বিশ্বাস
ii. সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন
iii. মানুষের অনিশ্চয়তা দূরীকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সোনারগাঁও উপজেলার লাঙলবন্দে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে স্নান করতে আসে। এ স্নানকে তারা পূণ্যের কাজ মনে করে।

৩. লাঙলবন্দে স্নান করা কী ধরনের অনুষ্ঠান?

ক. ধর্মীয় সম্প্রীতির খ. ভাবাবেগ বৃদ্ধির
গ. সামাজিক সংহতির ঘ. পারস্পরিক সংহতির

৪. উদ্দীপকে বর্ণিত আচার পালনের মাধ্যমে-

i. পাপ মোচন হয়
ii. মানুষ পবিত্র হয়
iii. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে উমাচিং মারমার সাথে রূপম চাকমার আলাপ হচ্ছে-

উমাচিং মারমা : মানুষ স্বপ্ন দেখা, ঘুমিয়ে পড়া ইত্যাদি অবস্থায় শরীরের ভিতরে অদৃশ্য কিছুর অবস্থান অনুভব করে।

রূপম চাকমা : শুধু মানুষ কেন, প্রাণীর দেহ থেকে শুরু করে গাছপালার মধ্যেও অদৃশ্য শক্তি বিচরণ করে। এমন চিন্তা থেকে ধর্মের উৎপত্তি ঘটে।

উমাচিং মারমা : সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবন ও জীবিকার অনেক কিছু পরিবর্তন হলেও ধর্মের উপস্থিতি রয়েই যায়।

ক. একেশ্বরবাদ কাকে বলে?

খ. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানুষকে নির্দিষ্ট কিছু আচরণ থেকে বিরত রাখে- এর মর্মার্থ লেখ।

গ. উমাচিং মারমা এবং রূপম চাকমার বক্তব্যে ধর্মের উৎপত্তির কোন ব্যাখ্যাটি প্রকাশ পেয়েছে? আলোচনা কর।

ঘ. উমাচিং মারমার সর্বশেষ বক্তব্য ধর্ম সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. সজীব গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে গেল। একদিন সে বাবার সঙ্গে তার গ্রামের অন্য ধর্মের একটি উৎসব দেখতে গেল। সজীব সেখানে দেখল একদল লোক হৈ হুল্লা ও আনন্দ করে একটি পশু হত্যা করছে? সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, এ লোকগুলো কেন পশু হত্যা করছে? বাবা উত্তরে বলল, এটা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে এ উৎসব পালন করে থাকে।

ক. ধর্মীয় দিক থেকে পবিত্র কাহিনিকে কী বলা হয়?

খ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

গ. সজীবের দেখা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় উৎসবের পটভূমি বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় উৎসবের প্রভাব মূল্যায়ন করো।